184

ভোরের কাগজ

তারিখ 30 NOV 1997
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

তদন্ত রিপোর্ট

পরীক্ষা দুর্নীতিতে কুমিল্লা বোর্ডে কর্মকর্তা অধ্যক্ষ থেকে পিয়ন পর্যন্ত জড়িত

ইব্রাহিম আজাদ : নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর অবৈধ প্রক্রিয়ায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার জন্য কুমিল্লা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ওভারটাইম নিয়েও কাজ করে। অবৈধভাবে কলেজ পরিবর্তনকারী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সরকারি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাই সর্বাধিক। বহিরাগত পরীক্ষার্থী পিছু ৫ হাজার টাকা নিয়ে একটি বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষের আয় হয়েছিল ৩৭ লাখ টাকা। কুমিল্লা বোর্ডের ১৯৯৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষার দুর্নীতি নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টে এসব ভাষ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়, অবৈধ প্রক্রিয়ায় পরীক্ষার এন্ট্রিফরম পূরণসহ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কলেজসমূহের অধ্যক্ষসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ছাড়াও বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও দায়ী। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের ১১ জন কর্মচারী ১৯৯৭ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্বে ছিলেন। এরাসহ সর্বমোট ২২ জন কর্মচারীর মাধ্যমে ১১ মার্চ '৯৭ থেকে ১২ এপ্রিল '৯৭ পর্যন্ত অফিস সময়ের অতিরিক্ত কাজ করানো হয়েছিল। আর এ কাজ ছিল মূলত অবৈধ পরীক্ষার্থীদের এন্ট্রিফরম পূরণ সংক্রান্ত। এজন্য ৮ এপ্রিল '৯৭ থেকে ৭ মে '৯৭ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরও ওভার টাইমে কাজ করানো হয়েছিল।

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, বিভাগ/গ্রুপ/বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষার্থীদের সম্ভাব্য তালিকা বা 'টটলিস্ট' সাধারণত অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে শিক্ষা বোর্ডে প্রেরণ করে থাকে। এরপর পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কিন্তু তদন্তকালে দেখা যায়, নির্ধারিত সময়ের পরও কিছু কিছু কলেজ বিপুলসংখ্যক অতিরিক্ত পরীক্ষার্থীর তালিকা সাপ্লিমেন্টারি স্টেটমেন্ট হিসেবে শিক্ষা বোর্ডে প্রেরণ করে থাকে। আশ্চর্যের বিষয় বোর্ড কর্তৃপক্ষও এসব অবৈধ তালিকা গ্রহণ করেন। ফলে এভাবে বোর্ডের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় কলেজ পরিবর্তনসহ অন্যান্য অবৈধ পন্থায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে।

বোর্ড থেকে সংগৃহীত এক রেকর্ডে দেখা যায়, চৌয়ারা আদর্শ ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ নির্ধারিত সময় অতিক্রমের পর ৫ ফেব্রুয়ারি '৯৭ তারিখে ৪০০ জন এবং গুণবতী ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ১২ ফেব্রুয়ারি '৯৭ তারিখে ৫০০ পরীক্ষার্থীর সাপ্লিমেন্টারি স্টেটমেন্ট হিসেবে বোর্ডে প্রেরণ করে। এ সম্পর্কে বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জহিরুল করিমের স্বীকারোক্তি থেকে প্রমাণিত হয় অবৈধ পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যাপক সহযোগিতা রয়েছে।

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, কলেজ পরিবর্তন করে অবৈধভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সরকারি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাই বেশি। এক হিসেবে দেখা যায়, কলেজ পরিবর্তনকারী ২০৩৭ জন অবৈধ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৭৮৫ জন অর্থাৎ ৮৫ শতাংশেরও বেশি সরকারি কলেজের। যারা বিভিন্ন সরকারি কলেজে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা করার পর মাধ্যমিকের মূল নম্বরপত্র কলেজ অফিস থেকে অবৈধভাবে সংগ্রহ করে অন্য কলেজ থেকে এন্ট্রিফরম পূরণ করে। এর কারণ সরকারি কলেজে তুলনামূলকভাবে নকলের সুযোগ কম থাকায় বেসরকারি কলেজের মাধ্যমে স্টার মার্কসহ উচ্চতর ডিভিশন পাওয়া। এতে মেধাবি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও নকল প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কুমিল্লা শহরের ৩টি সরকারি কলেজের ৭৮৩ জন ছাত্রছাত্রী তাদের কলেজ থেকে মূলনম্বরপত্র অবৈধভাবে বের করে নিয়ে অন্য কলেজ থেকে এন্ট্রিফরম পূরণ করে। এর মধ্যে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ২৬৬ জন; কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজের ২৬৩ জন ও কুমিল্লা সরকারি কলেজের ২৫৪ জন। বিষয়টি সরজমিনে যাচাই করার জন্য তদন্ত টিম কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে উপস্থিত হয়ে তদন্তও করে। এতে দেখা যায়, কলেজের একজন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী জনৈক কাশেম অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষের অজ্ঞাতে নিজেই অর্থের বিনিময়ে ছাত্রছাত্রীদের মূল নম্বরপত্র ফেরত দিয়েছে। প্রতিটি মূল নম্বরপত্র অবৈধভাবে ফেরত দেওয়ার জন্য ঐ কর্মচারী কাশেম ৫০০ টাকা করে নেয়। এতে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের ২৬৬ জন অবৈধ কলেজ পরিবর্তনকারীর কাছ থেকে তার মোট আয় হয় ১ লাখ ৩৩ হাজার টাকা।

তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, বেসরকারি কলেজের একজন অধ্যক্ষ সরকারি বেতন ভাতাবাবদ বছরে ৬০/৭০ হাজার টাকা পেয়ে থাকেন। কিন্তু বহিরাগত অবৈধ পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা আয় করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ চৌয়ারা আদর্শ ডিগ্রি কলেজের বহিরাগত ৭৪৮ জন পরীক্ষার্থীর প্রত্যেকের কাছ থেকে পরীক্ষার ফি বাদে গড়ে ৫ হাজার টাকা নিলে ঐ কলেজের অধ্যক্ষের আয় হয়েছিল ৩৭ লাখ টাকা।